লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্তম্ভপ্রতিম কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২–৭১)। 'কল্লোল'–এর ধারাবাহিকতা তাঁর ভিতরে প্রবাহিত, আবার তিনি নতুন বাংলা কথাসাহিত্যেরও এক বলিষ্ঠ উদ্‌গাতা। জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী এই লেখক অগ্রজদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন; ক'রে এগিয়ে গিয়েছেন অনেক দূর অবধি। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও যে তাঁর উৎসারিত জনধারা প্রবহমাণ, এও তাঁর সৃজনী সচলতার এক সাক্ষ্য। অথচ তাঁর সমগ্র রচনা কতটুকুই–বা : দুইটি গল্পগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস, তিনটি নাটক, কিছু অনুবাদ, অগ্রন্থিত কিছু কবিতা–গল্প–একাঙ্ক–প্রবন্ধ–গ্রন্থালোচনা। এই গল্প ও মহার্ঘ ঐশ্বর্যই তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক কৃতী পুরুষে পরিণত করেছে, প্রথম আধুনিক বাঙালি–মুসলমান কথাসাহিত্যিক রূপে মহিমা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীর মশাররফ হোসেন থেকে যে–বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা উৎসারিত হয়েছে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তার উত্তরসূরী ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক হিশেবে, নতুন রীতির নাট্যকার ও গল্পকার হিশেবেও, তাঁর অবস্থান বাংলা সাহিত্যে অমোঘ। মাত্র আটটি গ্রন্থ রচনা করে এই কৃতিত্ব বাংলা কথাসাহিত্যে আর কে অর্জন করেছেন!

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প–উপন্যাস–নাটকের কেন্দ্রমর্মে আছে 'উন্মুখ প্রবৃত্তি' আর 'মনোভাবের বিশ্লেষণ' (জগদীশ গুপ্তের ভাষায়)। বিংশ শতাব্দীর সূচনামুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে এই বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়। বহির্জগতের রূপায়ণ তো আছে; থাকবেই; তার সঙ্গে যুক্ত হল ব্যক্তি ও সমাজের দোলাচল, ব্যক্তির আরণ্যক অন্তর্ভুবন। আধুনিক কথাসাহিত্য বাস্তবের এই অন্তঃশায়ী তল্–টিকে আবিষ্কার করেছে, 'ভিতরকার মানুষ'–এর অবিরল উন্মোচন তার অভীষ্ট।

শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে—প্রদেশেরও! হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখথোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির শামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌছয় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হল্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা-জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ-লাইনে যারা নোতুন তারা চেয়ে-চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চিৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে—তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে আত্মীয়স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা—যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না—কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়— এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকরা। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে-কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌছেছে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরান মাঠ, সরভাঙ্গা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ।

ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গৌফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্‌জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশ্‌তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুঁকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আনিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতা'লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে-চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণো পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে-থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলির মসজিদ—এমন কি গ্রামে-গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ-কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে—যে-গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের পিঠে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল—সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে কুণ্ড এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে স্বসলমান। কেবল নোতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এ-দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

—আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

—আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে।

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবীর মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত, কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। ক্বচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে-কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে—মৌলবীর গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নোতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবীর চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়তো।

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রং দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধানক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে-ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুইয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন—চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে-ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের একপ্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে- চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাইয়ের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়. তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শীষ নড়ছে—নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙ্গুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয় নি। হয় নি তার প্রমাণ, ধানের শীষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধানক্ষেতের ফাঁকে-ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল, সে-গুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান-হয়ে-ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠল, তীরের মতো বেরিয়ে গেল একটা কোঁচ। সা—ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হা-করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

এক সময় ঘুরতে-ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙ্গুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শীষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়—সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নাবিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারির ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা—নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নাই।

এ-ভাবেই মজিদের প্রবেশ হল মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতী। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেবে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এইজন্যে যে তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চিৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারি ও মাতব্বর রেহান আলী ছিল, জোয়ান মদ্দ কালু, মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

—আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট-ছোট ইটগুলো বিবর্ণ, শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম খিচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

—আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ।—মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরুছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যে অমন বিদেশ-বিভুঁই-এ সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচইন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ সে-দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে-বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

— উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়িঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সে-জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। ইট-সুরকি নিয়ে সে-প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হল মাছের পিঠের মতো সে-কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতস্যাঁতে ছিল, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠল; হাওয়ারও ভাপসা গন্ধ খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠল।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগল। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা—ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।

ক্রমে-ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হল, গৃহস্থালি হল। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালুকাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে-জীবন পদে পদে এগিয়ে চলল। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সে-কথাটা সে-সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড়-বের-করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে, নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল। দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা-আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিল।

শেষে সে-প্রশস্ত ব্যাপ্ত-যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম তার রহিমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ। হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেল, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ—যে-দেহ দূর থেকে আলি-ঝালি দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিল—তা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর মধুর ভাবে হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

—অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

—অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা—থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ্।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়ারা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে-চেয়ে দেখে। দেখে রহিমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

—অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াত শুরু করে। গলা ভাল তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহানার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে-করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'লার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অবক্তব্য ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

পুকুরে গোসল করে সিক্তবসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহিমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে-দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহিমার চেতনা নেই।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—খোলা জাগায় অমন বেশরমের মতো দাঁড়াইও না বিবি।

সচকিত হয়ে রহিমা হাত নাবায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপটে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার-ওধার যেন বেগানা-বেগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। কিন্তু ওই তো কেবল মজিদ বসে আছে দরজার পাশে, হাতে হুঁকা। গলা-সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহিমার সারা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়।

মজিদের সামনে এমনভাবে আর দাঁড়ায় না কখনো।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ—চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে-জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়তো দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেবে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো-থাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের বাড়া হয়ে ওঠে। খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি—ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের

জমি—সব জমি একান্ত আপন; কোনোটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি—তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ-পানি খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে—তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকে পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে-জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট, ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা হাড়-বের-করা শ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা—ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে। নধর-নধর হয়ে-ওঠা কচি-কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে-কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ-খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে—মণ-কে মণ।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষাশেষি বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোঁচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খিলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শীষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল করে না? শোনদৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ-কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে-যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা গুনাগার।

জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে।

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মানুষের ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিকদেনেওয়ালা এ-কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

—কলমা জান মিঞা ?

ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে উঠে মজিদ বলে,

—হাসিও না মিঞা !

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে।

চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,

—আমি গরিব মুরুক্ষু মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সবকিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে—গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারি ধমকে ওঠে,

—কলমা জানস্ না ব্যাটা ?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারি একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলেমেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি—যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান—সেখানে একদা এক মক্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত ।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

—ব্যাপারির মক্তবে তুমি কলমা শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

—গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়তো মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে-কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারি ধমকে বলে,

—হইছে হইছে, ভাগ।

একদিন ধাড়ি ধাড়ি ছেলে কয়েকটি পাকড়াও করে মজিদ।

—কী রে ব্যাটা, খৎনা হইছে?

একটি ছেলে আরেকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,

—অর অয় নাই।

সে রেগে বলে,—অরও অয় নাই।

শুনে আগুন হয়ে যায় মজিদ। বলে যে, পরশুদিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দুজনেরই একসাথে খৎনা না হয় তবে মুশকিল হবে।

একবার একটি ছেলে বলে,

—হেই কবে আমার খৎনা হইছে!

তার বাপও মাথা নেড়ে সায় দেয়,

—ছোট থাকতেই খৎনা দিছি। মিছা কথা না হুজুর।

কিন্তু মজিদ বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছে, ছেলেটির খৎনা হয় নি। গর্জন করে উঠে বলে,

—তোল লুঙ্গি ?

বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিল, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিল, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মতো চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,

—আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু।

দাড়িগোঁফ ওঠা মদ্দের মতো ছেলে ঠির-ঠির করে কাঁপতে থাকে। বাপের মুখে রা নেই। শুকিয়ে সে-মুখ আমসি হয়ে গেছে।

সারাটি দুপুর কোরবানির ছাগলের মতো খুঁটি-বন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি। আছরের নামাজের পর মজিদ ছুরি-তেনা নিয়ে আসতেই সে তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠে কান্না জুড়ে দেয়। দেখে বাপের আর সয় না, সেও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। বাইরে লোক জমে গিয়েছিল। খালেক ব্যাপারিও এসেছিল ব্যাপার দেখতে। তারা ধমকাতে থাকে বাপকে।

দাঁত কড়মড় করে মজিদের। মাঠে শয়তানের মতো গান যখন ধরে, তখন খোদার কথা আর মনে হয় না? বুড়ো ধামড়া ছেলে, খৎনা হয় নি। ভাবতেও কেমন লাগে। তওবা, তওবা! ব্যাপারিকে শুনিয়ে মজিদ বলে,

—আপনাগো দেশটা বড় জাহেলের দেশ।

ছেলের কান্না থামে না। মজিদ যখন বাঁশের কঞ্চি ছিলছে তখন সে আরেকবার তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠে বলে,

—আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই—তানারে আগে দেন।

মজিদ বিস্ময়ে হতভম্ব। খালেক ব্যাপারির পানে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক হয়ে থাকে, মুখে ভাষা যোগায় না। লজ্জায় ব্যাপারির কান পর্যন্ত লাল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দু-দুটো খৎনা হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক হাটবাজারের মধ্যে যেন হল। কারণ বাপ-বেটাকে ধরবার জন্যে লোকের প্রয়োজন ছিল বলে, এবং এসব দৃশ্য না দেখে থাকা যায় না বলে ঘরটায় ভিড় জমে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, পেছনে বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলে পাড়ার যত মেয়েরা—ছুকরি, জোয়ান, বুড়ি। রহিমা পর্যন্ত না দেখে পারল না। স্বামীর কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও মুখে আঁচল দিয়ে খানিকটা হাসল।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্তবিস্তৃত হয়ে যে-মাঠ দূরে

আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রাম নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারি আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ অপরাহ্ণে যে-দুটি লোককে মজিদ কষ্ট দিয়েছে তারা নির্ভেজাল কষ্টই পেয়েছে : সে-কষ্ট পাওয়ার পেছনে ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারি চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহিমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহিমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত—সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।

রহিমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কাপড় পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোন বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন্ মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন—যাঁর রুহ্ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা ?

কখনো-কখনো অতি সঙ্গোপনে রহিমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আরজি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালুকাপড়ে-ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে,—না-হয় লজ্জা, না-হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজও অকর্তিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে-ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রূপালি ঝালর। রহিমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয় কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমিস্রার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। কিন্তু ঝালর ঝলমলিয়ে আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে। ওপরে আকাশ-ভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনোদিন রহিমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে—তার ওপর করুণা করো। কারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপরও করুণা করো, রহমত করো। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপরও যেন তোমার রহমত হয়।

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহিমার কাছে। যেমন আসে ধান-

ভানানি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে-ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিল, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

—আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহিমার হাসি পায়। কিন্তু মনে-মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

—আমার আর্জি—ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহিমা বলে;

—ক্যান গো বিটি ?

—জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহিমা প্রশ্ন করে,

—তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

—তুমি নিবা বুবু । তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু।

রহিমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

—আমার এক আর্জি বুবু।

—কও।

—ওনারে কইবেন—বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহিমা প্রশ্ন করে,

—ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

—হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার যোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বার-বার, ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাপিয়ে-ঝাপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না তখন শেষ অস্ত্র হানে।

—ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী—হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না!

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন—তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙ্গল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে—আর বর্ষায় টেকে কি না সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে-কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

—হুনছস্ কথা, হুনছস্?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

—ঠ্যাঙ্গা বেটিরে, ঠ্যাঙ্গা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

—থাক্, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করব।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উক্তি শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহিমাকে এসে বলে কথাটা।

—হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক—নয় ওনারে কন এর একটা বিহিত করবার।

হঠাৎ সমবেদনায় রহিমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

—তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুখা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিনতিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহিমা বলে,

—শ্বশুরবাড়িতে যাও না ক্যান?

—অরা মনুষ্যি না।

—নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর শখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রং ধরে। বতোর দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই; মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশমেজাজে বলে,

—শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

—খানকির বেটি নিকা করব বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে,

—গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিত।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ার, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায় : নিকা করবি মাগী, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে,—তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধমকে ওঠে।

—কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

—তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যামনে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারি গলায় বলে,

—আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মদ্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়তো সে শেষই হয়ে যেত—যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

—বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়াপানি দ্যান—

আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

—বিবিরে কইয়া দিও, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবৎ হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

—হুজুর, কোথিকা হুনলেন বেটির কথা?

—তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো—কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বলল কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্টপ্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাইয়ের সাথে জায়গাজমি সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা-মকদ্দমা করে আজ সবদিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি—যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়তো তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিল সে। স্থির থাকত না এক মুহূর্ত, নাচত কেবল নাচত, আর খইয়ের মতো কথা ফুটত মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে, তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে, কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তবে কি হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে যে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে-কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কি বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না—তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে! এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিল, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হত কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব উঠেছিল। একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কাণ্ডটি নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙ্গানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করে নি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুষ্টপ্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড় চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে-করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা—ওরে ভাতার-খাইকা জারুণি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর সে-ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফোঁড় দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহিমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। প্রথমে কিছু বোঝা গেল না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে

এইটুকু বোঝা গেল যে, সে রহিমাকে বলছে : ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য যানি দোয়া করে।

মজিদ হুঁকা টানে আর চেয়ে-চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে—এমন একটা বউয়ের স্বপ্ন দেখত প্রথম যৌবনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এইজন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীরকণ্ঠে রহিমাকে বলে,

—ওরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহিমা বলে,

—ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুঁটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে—থাক তাইলে এইখানে।

অপরাহ্ণে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙ্গা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারিও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তিবিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারি বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

—তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

—হেই কথা আপনারা ব্যাক্কই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারি আবার প্রশ্ন করে,

—এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো—এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

—এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগী ঝুটমুট একখান কথা কয়—তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারির আদৌ ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকি-ধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারি ধমকে উঠে বলে,

—কথা ঠিক কইরা কইবার পার না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও।

বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারি আবার বলে,

—তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙ্গাইছ ক্যান?

—আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙ্গাইছি!—লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙ্গুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে—বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারি কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারিকে বুঝিয়ে বলেছিল সে, এবং ভেবেছিল তার পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারিই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষগুণে সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে ফেরেশ্‌তাও আছে। তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরী বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে—তারা এইসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীরকণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে।

—পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরীতে প্রিয় পয়গম্বর বাণি-এল মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। একটি নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব—যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল। হজরতের এত পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগল। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবদ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতা'লা মানবজাতিকে বললেন—

থেমে বিসমিল্লাহ্ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে, স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে, করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে-লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিল, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নাবায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন,

মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ-শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়। তার গুনাহ্ বড় মস্ত গুনাহ্, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

—তুমি কী মনে কর মিঞা? তুমি কি মনে কর তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কি হলফ কইরা বলতে পার তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারির মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস্-ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাঁটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ—এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচত, হাসিখুশি উজ্জ্বলতায় চারিদিকে আলো ছড়াত, তখন যে-জনরব উঠেছিল সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করে নি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতও, সে তাকে তালাক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাত না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস—তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

—কী মিঞা? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

—কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

—কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

—তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙ্গাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ্ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে-বেয়ে আসে,

ঝরে–ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

—তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পইসার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সে–কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে নি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে–কথা সত্যিই। এবং লোককে এ–কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে–কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে চেলাকাঠ দিয়ে এ–মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ ছেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠেই না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

—দেখ তো, ব্যাটা কি মরল নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে কও! মুখে লাগাম নাই তোমার?

হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

—তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বড় ভয়ে–ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে বলেছে, কিন্তু একবার হাতে–নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো–কখনো। কখনো–বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

—বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু–দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে–ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শোঁ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মা'র হৈ–হৈ করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেল রে, ছাগলটা কোথায় গেল রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেল রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি–পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী–একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু–হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট–পিট করে তাকিয়ে কুর–কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে–টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য–শূন্য ঠেকে। বলে,

—আমারে চাইরডা চিঁড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিঁড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধা রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিঁড়া-কটা গলাধঃকরণ করে বলে,

—পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া-মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।

বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

—আর চাইরডা চিঁড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিঁড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে-গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে,

—মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতি-গতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে, হু-হু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেল। কেউ বলতে পারল না গেল কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবেছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার যো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কতদূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাত, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তেলাওয়াত শুনেছে অনেকদিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

—আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে উঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা—।

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ—যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে—সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে উঠেছে কিনা জানবার জন্য কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি, তাদের মধ্যে

অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির-অস্থির করেছিল—যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহারহস্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টিরহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়—সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মার মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

—খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে।

—বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্রথম-প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসত না। লজ্জা হত। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে-ক্রমে আসতে লাগল। কখনো কৃচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াত, আর বুকটা দুরু দুরু কাঁপত ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেল তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেল। মজিদের হাতে হুঁকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

—হুঁকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুঁকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুঁকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে,

—আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে-ক্রমে সে খোলামুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষ তো রহিমা আর সে। ধান এলানো-মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা—কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরোনো আরজি জানায়। রহিমাকে বলে,

—ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহিমা রুষ্টস্বরে বলে,

—অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বলা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রং, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

—আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনিরে একটা জামা দিলে ও পরত'খন।

হঠাৎ কী হয়, রহিমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসত। আজ হাসেও না।

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহিমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ-রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে-ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশপাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে শিরশির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে, এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহিমাকে সে লক্ষ করে নি, সে-রহিমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহিমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

—পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহিমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

—ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করণ লাগব।

—থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে-মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি, ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোঁকে। শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা? তারই দেয়া বেগুনি রঙের শাড়িপরা মেয়েলোকটিকে—খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্বলজ্বল করছিল উজ্জ্বল লালিত্যে—তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন। তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহিমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা

দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিদ্ধ হয়েছে কি না। সেও তাকায় না রহিমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পূর্ব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্মপ্রত্যূষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নোতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগরার পর মগরা ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে-চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তানার দোয়া।

শুনে কারো কারো চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগরাগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারো কারো বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়—বর্ষিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারি কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজকামকে অবহেলা করতে বলেন নি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কি আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

—বলে মজিদ চোখ পিট-পিট করে : যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

—খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে-রহমতের জন্য সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারি করে। কিন্তু আবার দু-মুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন -দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কল করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

কিন্তু আজ সকালে মজিদের সে-চোখে একটা জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে থেকে-থেকে। গনগনে আগুনের পাশে বেগুনি রঙের শাড়িপরা একটি অস্পষ্ট নারীকে দেখে। স্মৃতিতে তার উলঙ্গ বাহু ও কাঁধ আরো শুভ্র হয়ে ওঠে। তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি

ঘাড় চুলকে নিতিবিতি করে বলে,

—যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মণ ধান হলে অন্তত এক শ মণ বলা চাই। বতোর দিনে উঁচিয়ে-উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয় নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না উঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হল এই।—গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির-যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতিভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের।

দিন কয়েক হল তিন গ্রাম পরে এক পীর সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

পীর সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিল তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একদা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ দূরদেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পীর সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই—কেবল বৃহৎ খড়্গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো-এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর-ভারতে কোনো-এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে-গল্প তাঁর রুহানি তা'কত ও কাশ্‌ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোন্‌কার-মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রুহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে-অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো-কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা ব্যক্ত করে। কিন্তু করে এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে, তা মহৎ ব্যক্তির দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মজিদ নিশ্চিন্ত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে-বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা,

প্রকাশের কথা নয়। এতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কি সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু ক-দিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পীর সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পীর সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তাঁর নুরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারো চোখ ঝলসে যায়, কারো এমন চোখভাসানো কান্না পায় যে, আর এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারি বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহিমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে—

—আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহিমা হঠাৎ বলে,

—এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

—মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহিমা দমে গেল। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহিমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে-দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

এক সময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালুকাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ার কি যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা উঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহিমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচইন। একটি হাঁটু উলঙ্গ হয়ে মজিদের দেহ ঘেঁষে আছে।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছল তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার বাড়ির সামনেকার মাঠটা লোকে-লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পীর সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পীর সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পীর সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে পাখাটা থেকে-থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে-তালে ওঠানামা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময়ে পীর সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিঞা হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে, হয়তো তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুলও নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা বলে, কারো-বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে।

আধঘণ্টা পরে শীতের দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে এমনি সময় হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠল। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল।—পীর সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পীর সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পীর সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সো'য়ালে তুরা সো'য়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন—সোহবতে তো'য়ালে তুরা তো'য়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে)—তখন গোটা জমায়েতেরই সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পীর সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল-হয়ে-ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা-সঞ্চালন

দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পীর সাহেবকে ঘেরাও করে ফেলল। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারল ধরল,—কেউ পা, কেউ হাত, কেউ–বা আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পীর সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এই আক্রমণ তাঁর বোধহয় সহ্য হল না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায়–হায় করে উঠল পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা, আর তা শুনে জমায়েতও হায়–হায় করে উঠল। সাঙ্গপাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এই মর্মে যে, তাদের পীর সাহেব তো শূন্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস–ভারি পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনের দ্রুতবিস্তারের মতো পীর সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে–না –দেখতে ছড়িয়ে গেল। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিল, এবার তারা মরাকান্না জুড়ে বসল। পীর সাহেব কি তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ–মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারী ঢেউয়ের মতো সম্মুখে ভেঙে এল জনস্রোত। অনেক মরাকান্না ও আকুতি–বিকুতির পর পীর সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

—ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেল।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠল। শত শত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠল।

সে–কণ্ঠ মজিদের।

—যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মশকরা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগাল শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ–পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করল,

—চেঁচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

কোন নামাজ হইল এটা?

—কাহে? জোহরকা নামাজ হুয়া।

উত্তর শুনে আবার চিৎকার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পীর সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু, ভাদ্র মাস থেকে ছায়া আছলী এক–এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, দু–কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বললে,

—কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারল না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

—মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কারো কারো মনে ভয়ও হয়েছিল—এই বুঝি পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এল।

মতিগঞ্জের সড়কে উঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুতু ফেলে, তওবা কেটে, নিশ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্করেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারিকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকাল। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথে-চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করল—ভাই সকলরা সকলে অবগত আছেন যে, বে'দাতি কোনো কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশলসহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া, শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হল বে'দাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেল, তাহলে তার শয়তানি রইল কোথায়।

ভণিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে।—আওয়ালপুরে তথাকথিত যে-পীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে—যে-মুখোশকে ভুল করে মানুষ তাঁর কবলে গিয়ে পড়ছে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে-উদ্দেশ্যই তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচ ওক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ—যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজা করেন নি—তাঁরা খোদার কাছে গুনাহ্ করছেন।

এই পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারি বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

হনলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হল, অন্তত এ-গ্রামের কোনো মানুষ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেল না যে তা নয়। কিন্তু গেল অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পীর সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হল। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেশ্‌ত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল কতক্ষণ।

কালু মিঞা গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যাণ্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর, সুললিতকণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিঞা শোনে কিনা কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউণ্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে,

—পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে! ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।

ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকষশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউণ্ডারের। প্রথমে দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকতে-ঝাঁকতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিঞার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুঁকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

—কোনো চিন্তা করবা না মিঞা। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে, হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদর যত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবাশুশ্রূষার শেষ নাই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরো শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বলেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যা; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যা কথা কয় বলে মনে-মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যা কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কিনা, তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও স্বচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে-ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছেন তিনি সোজা লোক নন। বহু-পুরুষ আগে দীর্ঘপথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ-পানিতেও একেবারে আনোনা হয়ে যায় নি। পান্‌সা হয়ে গিয়ে থাকলেও পীর সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিস পাবার যো নেই। সে-জন্য মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাতদিন আরো খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিন গ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পীর সাহেবের মনে ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর জঈফ অবস্থা। এ-বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ-হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাকরেদদের মধ্যে কেউ-কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গি ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পীর সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উলটো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাকরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। সেদিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারে নি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পীর সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হল খালেক ব্যাপারির প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়তো-বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নোতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন সেও কণ্ঠ কাতর করে বলতে পারবে, তার গা-টা কেমন-কেমন করছে, বুক ঠেলে কেবল যেন বমি আসতে চায়। তখন নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষকাটালে। কারণ যৌবনের দিক থেকে সে তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগাং না হলেও একেবারে টস্‌কানো নয়, বোঁচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়। রঙে ছ্যাতা পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রং ধবধব করে; নাকে সতীনের মতো জ্বলজ্বলে নাকছাবি না থাকলেও তা খাড়া, টিকলো। তার সন্তান আকাশের চাঁদের মতো সুন্দর হবেই।

কিন্তু মুশকিল হল কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারিকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয় নি, পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পীর সা'বের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারি। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

—পানিপড়া ক্যান?

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারি যেন বিনা উত্তরেই বোঝে,—তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারি বোঝে। তারপর বলে,—আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পীর সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউয়ের খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধত না, কারণ পীর নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-

অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারি তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হল শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা। এবং সমাজের মূল হল একটি লোক—যার আঙ্গুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হল মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারি কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবির কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারি।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলামিঞা। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দু-টি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারি হয়তো-বা শালার সঙ্গে খানিক মশকরাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারি বললে,

—একটা কাম করেন ধলামিঞা।

ব্যাপারির সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অস্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে,

—কী কাম দুলামিঞা?

কী তার কাজ ব্যাপারি আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথম বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতাসহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে—যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ-গ্রাম থেকে গেছে এ-কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পীর সাহেবের দোয়াপানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়ার একটা ছেলের জন্য বড় শখ হয়েছে। শখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হল এই যে, শেষ পর্যন্ত কোনো ছেলেপুলে যদি নাই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালবার আর কেউ থাকবে না। মোটকথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পীর সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরব্বি। তবু ধমকে ধামকে কথা বলে ব্যাপারি। পরগাছা মুরব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা!

—কী গো ধলামিঞা, বুঝলান নি আমার কথাডা?

—জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাত করে ধলামিঞা জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে-মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে, এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেবংশী।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুলগাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিল যে, যে-সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুলগাছের ফাঁড়াটা কাটলেও ওইখানে গিয়ে পীর সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাত সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা লোক ধলামিঞা!

—ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারি প্রশ্ন করে।

—জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারি বলে,

—আরেক কথা। কথাডা খানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

—তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিঞা ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলামিঞার কালামিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারির অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুঁকায় টান দিচ্ছিল, হঠাৎ সেটা নাবিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢং দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,

—আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারি তখন যে-দীর্ঘ ভণিতাসহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর রং ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে-ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলামিঞা কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারি আর কী করে। ধলামিঞাকে ডেকে বলে দিল, আওয়ালপুরে গিয়ে পীর সাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলামিঞা হঠাৎ ফিচকি দিয়ে হাসে।

—আওয়ালপুর গেলে কি আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানিপড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারির মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব?—আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা—আর কথাডা একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়! তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলামিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

—কী কন?

—কী আর কমু। এই সব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত, না মামলা-মকদ্দমা? দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলামিঞার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশী তেঁতুলগাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পীর সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়তো ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলামিঞা বলে,

—আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

—যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্টস্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারি মিঞা যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

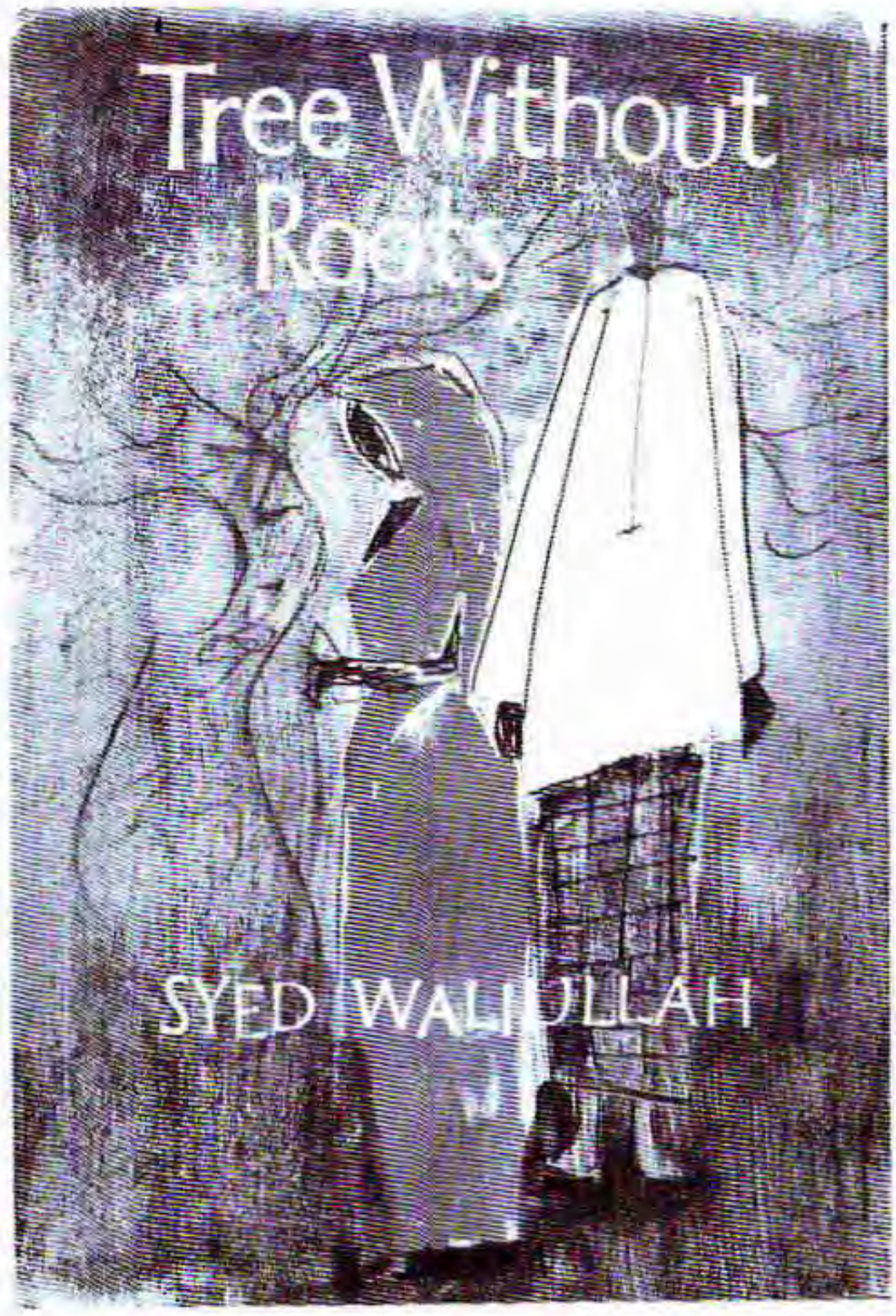

লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের
প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলামিঞা হতাশ হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

—হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামুনে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলামিঞার মতলব, শেষরাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পীর সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারি যে-টাকা দিবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারির কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

—তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক-বিবেচনার কাম?

টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে,

—না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলামিঞা বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। বিবির খাতিরে ব্যাপারি মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করে সে-ঠক পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্য—সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো যেন।

ধলামিঞা ভারিমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারির বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নোতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু-জনে গরুছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে। মজিদের ধামড়া গাইটার পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহিমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে মজিদ। তারপর এক সময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

—হেই পীরের বাচ্চা পীর শয়তানের খবর কী? এহনো ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সটকাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারি ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারির মনে হয়, তামাক-ধোঁয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

—কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারি উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়তো গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,

—তাইলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

—লোক পাঠামু তানার কাছে? বিস্ময়ে ব্যাপারি ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে-করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙা করে তুলে ব্যাপারি বলে,

—হেই কথা আমিও ভাবতাছি। আছে কি না আছে—হুদাহুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন-বোঝানো আর কী। ঠগ-পীরের পানিপড়ায় কি কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারি ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে বলে-বলে করেও বলতে পারে নি। আসল কথা তার সাহস হয় নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুঁকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারির মতো বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়—শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারি আরো বলে যে, ধলামিঞাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে—ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

—ধলামিঞারে যতটা বেকুব ভাবছিলাম, ব্যাপারি বলে, ততটা বেকুব হে না। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের শখ হইছেই—

মজিদ বাধা দেয়। ধলামিঞার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

—খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কি জোর নাই?

—আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

—কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কী, তাগো কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারির মস্ত গোঁফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

—ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কী করি এহন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

—তানারে কন, পেটে যে বেড়ী পরছে হে বেড়ী না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ী খুলব?

পেটে বেড়ী পড়ার কথা সম্পূর্ণ নোতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারির চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ী, কিসের বেড়ী?

মজিদ হাসে! ব্যাপারির অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

—পেটে বেড়ী পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোদ্দ। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ানো যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দ প্যাঁচ!

ব্যাপারি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আমার বিবিরডা ছাড়ানো যায় না?

—ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগব কয় প্যাঁচ তানার।—কথাটা শুনে ব্যাপারি আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে—তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহেরি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরিফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া-দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে।

তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

—তয় বুঝতে হইবে যে, তানার চোদ্দ প্যাঁচ কি আরো বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। এক সময় আড়-চোখে ব্যাপারির পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরো দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ উঠে পড়ে।

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না! সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরো কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

—কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিল সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকীসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাসখানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিল মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে,

—মা মরছে!

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কত শত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

—আহা, ক্যামনে মরল গো বিটি?

—এ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

—ছ্যামরারা কই?

—আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।

—দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছে নি?

—করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়ব।

খিলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

—মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিল নি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

—মাফ চাইছিল কিনা কইবার পারি না!

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুঁকড়ানো রগ-ঝোলা যে-মৃতদেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদমগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়তো দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ, সে-কবরে লোক-চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করবে—এ কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

—মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাঁধে। থেমে বলে,

—খোদা তারে বেহেশ্‌তে-নছিব করো, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়তো-বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার বাপের উপর এত কড়া না হলেও পারত। কিন্তু কী করবে। তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে না তো?

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পীর সাহেবের পানিপড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিল কিন্তু পেটে বেড়ীর কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হল। আস্তে-আস্তে একটা ভয়ও এল মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদ্দ কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউয়ের তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্তু এ-সব কথা হলে বাতাসে কথা কইতে শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারো সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ে। মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শীরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহিমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়—পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে, গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহিমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এক সময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

—বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

—আমি দেই নাই।

—দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে।—তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চোদ্দ প্যাঁচ?

রহিমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

—তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এ্যামনেই বোঝে।

—তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারি।

রহিমা মুশকিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাত আছে সে কথা কী করে বোঝায়। তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহিমা আস্তে বলে,

—তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহিমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

—পড়াপানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

—না যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

সূর্য যখন দিগন্ত–সীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান–মদ্দ দু–জন বেহারা পালকি এনে লাগাল অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারির বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারি হাঁকে,—কই, তৈয়ার হইছেন নি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুস ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাসে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

—ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরিফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে এক দিনের রোজাতেই একেবারে যেন ভেঙে গেছে। গায়ে–মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি–গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে—ক–ঘণ্টায় যে–ভয় দীর্ঘ রোগভোগ–করা মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারল সে যদি আজ জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ–প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কি, তের বছরের কথা একদিনে জানে নি, জেনেছে ধাপে–ধাপে ধীরে–ধীরে, প্রতিবৎসরের শূন্যতা থেকে। সে–শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে–বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু–বা

লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক কি ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে-ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি-গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকেদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো-বা পারত, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা, খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা করে না। এ-সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মসলা যুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মশকরা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহারারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নাবিয়ে রাখল।

ব্যাপারি মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে,—নাবব ?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

—তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজু আছে নি ?

ব্যাপারি ছুটে যায় পালকির কাছে । পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,—আছে নি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

—তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পালকির পর্দা ফাঁক করে নাববার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে-পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করে নি। মজিদের গলার কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পালকি থেকে নেবে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়-চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নোতুন বউয়ের মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মাণ নোতুন বউয়ের আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধা খোলে। ঘরে ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোর সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে-নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মতো শত-ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনীতে। তথাপি

মহা-আকাশের মতো সে-মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহা-আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখে নি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্মসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

—তানারে বইবার কন।

ব্যাপারি বিবিকে বলে,

—বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সে আবার চোখ বুজে থাকে। মনে হয় তার শান্তি হয়েছে, আর আশা নেই। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়তো মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে-থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়ায় হয়তো-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোন আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নাববার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা—দেখে স্নেহ-মমতা না উঠে এসে, আসে বিষ। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠত তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালুকাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেত। এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো-হাওয়া রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, আসে উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে—যেখানে কাদামাটি লাগে নি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারির ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারির মেদবহুল স্ফীতউদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারে নি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই ঠক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণ্যমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

—পানিটা দেন।

ব্যাপারিও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝঙ্কার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে

ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির ম্লান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে,—তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়! দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

—আমি দোয়া–দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ্ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালোরঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে সাপের গলাটা সামান্য চমকে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

এক পাক, দুই পাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে–স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে–স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয় নি, হাসে নি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা—বছরে বছরে যে–বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে–সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ–দুঃখ অভাব–অভিযোগ নেই। একটা প্রখর–অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

এক পাক, দুই পাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক–পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়তো–বা তাকে আলিঝালি দেখল। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখল না, জানল না ক–প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানল না মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক–পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠত।

ব্যাপারি বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে,—কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে–মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহিমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়তো আসত যদি না সঙ্গে থাকত ব্যাপারি। মাজারঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিল। সঙ্গে হাসুনির মা–ও ছিল। রহিমা মনে–মনে স্থির করেছিল, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, শখ করে যে ফির্‌নিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু–দণ্ড সুখ–দুঃখের গল্প করবে। নিজে সে স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যাই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহিমা যে–দৃশ্য দেখল তারপর গল্পগুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হল। ব্যাপারির লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে

ভেতরে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল পাঁজাকোলা করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। শখ করে তৈরি করা ফির্‌নির কথা বা পান খেয়ে দু-দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেল।

মজিদ আর ব্যাপারি মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইল, দু-জনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুঁকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারিকে ডেকে নিয়ে গেল। দু-জনেই এক এক করে হুঁকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানিপড়া খাবার শখ হয়েছিল সে-আমেনা বিবির ওপর—আকার-ইঙ্গিত বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও—মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিল। তার একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে স্থির করেছিল। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে-প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিল। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেল, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখাল, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিল না। দিয়েও দিল না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখাল, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিল।

হুঁকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারি কথা বলে। বলে,

—দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানিপড়াডা দিলাম—তা কিসের জন্য? শরীলে তা'কত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারি মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

—তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

—আপনে তানার স্বামী—ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারির চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ করে দেখে মজিদ। ব্যাপারির চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আস্তে হুঁকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না উঠেছে। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দু রক্ত—টাট্‌কা, লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা, হতপ্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচমকা ব্যাপারি মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,

—কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কি কোনো কথা আছে?

একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,

—না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তের বছর বয়সে ফুটফুটে যে-মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির

আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারি হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নার পানে বেদনাভারি চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারি যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

—কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছে নি ?

ব্যাপারি ভারি গলায় আস্তে বলে,

—আছে।

—হে তহুর বাপের কথা মাইনষেরা ভুইলা গেছে। এমন কি তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারি প্রশ্ন করে,

—ক্যান ?

—কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইল এই : পাক-দিল আর গুনাগার-দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুনাগার-দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক-দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুনাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারি কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাঁধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে-বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুনাগার হয়েছে, পাপীও ভালো মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারি ছাড়ে নি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারি অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—আপনে কি কিছু সন্দেহ করেন?

—সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।

এই সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়াল। ব্যাপারি প্রশ্ন করে,

—কী গো বিটি ?

—তানার হুঁশ হইছে। বাড়িত যাইবার চাইতাছেন।

মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারি উঠে দাঁড়াল। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পাল্কিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খিলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারি চলে গেল। তার মনের কথা জানা গেল না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য—আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখল না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে-মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে-ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

এতবড় সমস্যা ব্যাপারির জীবনে কখনো দেখা দেয় নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হত না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেত, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানে নি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারে নি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারি কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুঁকার নীলাভ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারির চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারি ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত হয় একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই; আরেকবার মনে হয়, সে-শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

তের বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলিগলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না; চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিল না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুঙ্কার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমন কাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারির কান দুটোতে রং ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারি কি কখনো করে নি? ব্যাপারির মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়তো অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নাই। সহসা খালেক ব্যাপারি মনস্থির করে ফেলে।

এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পালকিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওনা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায় নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পালকির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসত। সেটা হল খোতামুখো তালগাছটা। বহুদিনের গাছ, ঝড়ে-পানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পালকির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝত যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘপাতের মধ্যে ওইখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতোগুলো খসেও এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভ্রূ কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে শৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিন বছর অন্তর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয়, এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারিই। খরচ করে তার আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরোনো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে সে-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রং চটে যায়, বা সালুকাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া—তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারি হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কি ক্ষমা নাই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হল তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করে নি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে-অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা বিড়বিড় করে বলে,—তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালুকাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারি। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশোনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এইজন্য আরো বেশি বোধ করল যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচকা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর

সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিরা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখল না। ভাবল, বিদেশী হাওয়ায় মাথাটায় একটু গরম ধরেছে। তা দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কি দু-দুটো মক্তব বসানো হয় নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগল চরকির মতো। ইস্কুলের জন্য দস্তুরমতো চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারির বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনোপ্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল,

—কী হুনি ব্যাপারি মিঞা?

ব্যাপারি বলে, কথাডা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হল। আক্কাস এল, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এল।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে—এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এল। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রগ। ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে,

—তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইস্কুল হবে কি হবে না—সে-আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারো ছাঁটা, কারো স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারো-বা প্রচুর বৃষ্টিপানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—তুমি না মুসলমানের ছেলে—দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসে নি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদবিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিশ্বাস রুদ্ধ করে ছিল এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না কী জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

—আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ—তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারি বলে,

—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কি আর ঠাণ্ডা থাকে?

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কি সত্যি?

আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,

—আপনি যা হুনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

—তা এই বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজকাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার–ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুবির কথা কেউ কি কখনো শুনেছে? শোনো শোনো, ছেলের কথা শোনো একবার—এইরকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো–হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে–দিনকালের কথা কইল তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতিগতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে—।

সকলে একবাক্যে সে–কথা স্বীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বৈকি। সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচ ওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে,—মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে–ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত—আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজিদের এক শ দররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে,—ভাই সকল। পোলা মাইনষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে—তা নিয়া আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধিশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান–চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে—এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নোতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল। ব্যাপারির নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে,

—বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন !

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে–মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক যানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন—আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এক সময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

—তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ–কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

—চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে উঠে ঘর

থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে-গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালি বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারো না কারো যেন যৎকিঞ্চিৎ হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এই ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারি তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বার আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশ-খোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটল। কানাঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নোতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাঁজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাঁজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে-মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোনো অন্যায়ে বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারি আঘাত পেয়েছে। সে-আঘাত এখনো শুকায় নি। তাই হয়তো দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

—ভাই সকল, আপনাদের কী মত ?

ব্যাপারিকে নিরাশ করবে—এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হল, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আস্তই হোক—একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা পাকা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি কারিগর এসেছে, আর গতর খাটবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তাছাড়া শীতের হাওয়াশূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত

দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নাই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিল এই মহব্বতনগর গ্রামে। সেদিন ছিল ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে, এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে। এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন-কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে-কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দরুদ পড়ছিল মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নাবিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রূপালি ঝালরওয়ালা সালুকাপড়টা এক কোণে উলটে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকার চরে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের ম্লান আলোয় কবরের সে অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরই, কিন্তু সে জানে না কে চিরশায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার এক যুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উলটানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন—যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহিমা স্বামীর পা টিপতে-টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহিমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে-মনে ভাবে।

একসময়ে মজিদই বলে,

—বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহিমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে,—আমার বড় শখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

—নিজের রক্তের না হইলে কি মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া দেয়। মহড়া দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মতো ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহিমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

—আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখাচ্ছিল। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে

। কথাও স্মরণ হয়েছিল যে, জীবনকে সে উপভোগ করে নি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরিফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরানপাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে—তাতে যেন কোরানপাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহিমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিল। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়–চোখে চেয়ে–চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিতা কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহিমাকে বলে,

—বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্য রহিমা পা টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

—বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম?

সাথী মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহিমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহিমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী কও?

—আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহিমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে–থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছু নেই।

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনা মেহমান অতিথ–এর হৈহুল্লুস্থূল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারিকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সবকিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নোতুন বউয়ের নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে–চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

একসময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—হে নামাজ জানে নি?

রহিমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

—জানে।

—জানলে পড়ে না ক্যান?
জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহিমা সরাসরি উত্তর দেয়,
—পড়ব আর কি ধীরে-সুস্থে।
আড়ালে রহিমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,
—তোমার হে মানসম্মান করে নি?
—করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।
তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে-ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে—এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহিসুন্দর হাসির ঝঙ্কার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনে নি। রহিমা জোরে হাসে না। সালুআবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে তারাও কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হু-হু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝঙ্কার ওঠে না কখনো। এখানকার কথা ছেড়ে দিলেও, আগেই-বা কবে মজিদ এমন হাসি শুনেছে! জীর্ণ গোয়ালঘরের মতো মক্তবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবীর সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অন্নসংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভ্রূ।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

—কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

—মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহিমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলা নি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নাই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে উঠে রহিমা বলে,

—জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনব।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে-হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

—একটা মজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহিমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—কী কথা বইন?

—কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

—কও না!

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

—তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

—কারে দেখাইছিল?

—আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মশকরা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর—হঠাৎ আবার হাসির একটা দমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে—আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কি অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হল না। রহিমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেল।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে একসময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত উঠে ভারি হয়ে থাকে। রহিমার অলক্ষ্যে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা, তারপর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহিমা যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর বোনে, থেকে-থেকে মাথা ঝেঁকে চোখ-নাক মোছে।

রহিমা আস্তে বলে,

—কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পসলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহিমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিল এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সবসময়ে বোঝা যায় না। রহিমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমো খায়।

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিস পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে—পূর্বাহ্ণে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহিমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখে তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শণের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে যাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে।—ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত

ছেলের রুহের জন্য দোয়া করা; সে যেন বেহেশ্‌তে স্থান পায়, তার গুনাহ্ যেন মাফ হয়ে যায়—তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ–দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ-চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুঁশ নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেল। দুপুরের আগে মজিদকে নিকটে কোনো এক স্থানে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশ নাই।

রহিমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে–ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ, তারপর আবার আড়–চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ–বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহিমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

—ওইটার হইছে কী?

রহিমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

—মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—কিন্তু ... ক্যান খারাপ করছে?

রহিমা সে–কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

—ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ওইরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুঁকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ার হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে–ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হত নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী—তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ। কিন্তু সদ্য বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢং? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে। বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কি ঘরে বলা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহিমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গোয়ালঘরের দিকে চলে যায়।

সে–রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে যেন সে–বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কূল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে—এই ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শণের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি।

কিন্তু সে–বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে-মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে!

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়তো এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে–ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টিমধুর আশার কথার জন্য খাঁ–খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকিধিকি করে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল—তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে–ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ যে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারি হয়ে এল তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহ আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝল না, তারপর ধাঁ করে উঠে বসল। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরাল।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহিমা শোয়। সেখানেই রহিমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল—যেন মাই খেতে–খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিল, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হল সে–কথা।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহিমা যখন গোয়ালঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহিমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে উঠে রহিমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুষি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

—জমিলা কই?

—ঘুমাইছে বোধহয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা–কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে–রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে উঠে ঢাকাঢুকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

—ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছে নি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধঘণ্টার মতো। তারপর কোনোপ্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু রহিমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিল বলে সে–কথা সে জানে না।

—কী জানি, বোধহয় পড়েছে।

—বোধহয় বুধহয় জানি না। খোদার কামে ওইসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া

তারে ঘুম থিকা তোলো, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহিমা নিরুত্তরে ভুষি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ সোঁ আওয়াজ করে ভুষি খেতে শুরু করে, কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহিমা যখন ধীরে-ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না। রহিমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহিমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়তো মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীতবিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করে নি কোনো দিন। আজ তার ঘরের একরত্তি বউ—যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে—সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে-ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহিমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখে নি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

ভীতকণ্ঠে রহিমা বলে,

—ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কি রাগ করা যায়?

—রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এই বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই। এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এরপর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে-সতর্কতার গুণটা হারায় নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

—ওর দিলে খোদার ভয় নাই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরানপাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সিঁথি কাটছে।

তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে-করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে—দাঁতের আশেপাশে, ওপরে-নিচে। ঘষতে-ঘষতে ঠোঁটের পাশে ফেনার মতো থুতু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়-চোখে একবার তাকায় বউয়ের পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই—মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে-করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। এক সময়ে সশব্দে থুতু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুর ঘাটে যেমন থাক থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুতু ফেলে, তারপর বলে,

—রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষিপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

—তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছ, তা কী শক্ত গুনার কাম জান নি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কি ডরাও না, দোজখের আঁগরে কি ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

—তাছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি! এই ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তাঁনার রুহের দোয়া মানুষরে শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুতু ফেলে মজিদ পুকুরঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মতো। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোশতে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগসহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যেদিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল-মশলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহিমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারির বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর

খাওয়াদাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মশলা এল ব্যাপারির বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মশলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরের উঠানে চুলা কাটা হল। শীঘ্র সে–চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকেরা এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগল। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হল দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে একগোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো একভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘতখানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে ধীরে-ধীরে, প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে–দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এই যোগশূন্যতার মধ্যে এ–কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে–নাবতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীরগতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরের মতো নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে দুনে চড়ে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে–বলকে একটা অস্পষ্ট, বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে–হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া–মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু হু হু । আবার : হু হু হু। আবার—

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে–শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহিমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে–চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া–পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক–আসা দেখে জমিলা, আর সে–ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন একসময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে–ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে! বালুতীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে,

তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহিমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে, কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল : চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা, থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহিমাকে ডাকে,

—বুবু!

রহিমা শোনে কি শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চিৎকার ওঠে। সঙ্গে–সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারে না। এবার ভেসে যাবে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদ্যুদ্গতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্টকণ্ঠে আবার ডাকে,

—বুবু!

এবার রহিমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে–চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছুই বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে–করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে, আফসোস করে, কেউ–বা এ হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে–চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে–ধীরে সে উঠে বসে, তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে–ঘুরে সবার দিকে তাকায়। একসময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,

—পাগলি ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এই বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়তো তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে–থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ–ক্ষিপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয়

গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে-একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

—ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে, কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ, তারপর বলে,—আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়াদাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধা নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহিমা তখনো বসে আছে, পাশে নাবিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে–বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহিমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হল কি খারাপ হল এইবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

—হে কই?

রহিমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ উঠে চলে গেল তারপর আর সে এদিকে আসে নি। আস্তে রহিমা বলে,—বোধহয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

—ও যে একদম বাইরে চইলা গেল, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহিমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

—হে বাইরে গেছিল?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

—হ্!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত–পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিবন্ত হুঁকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিল মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধ হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিশ্বাস রুদ্ধ–করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে–নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে তা ভেঙে টুকরো–টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহিমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে–মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লম্ভার মতো মেয়েটি যেন এ–সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বলা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে–সংসার গড়ে উঠেছে সে–সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহিমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে—বিবি, শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহিমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সেদিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

—বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলা নি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহিমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্নকণ্ঠে উত্তর দেয়,

—তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখদুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহিমাকে বলে,

—কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়ের কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট করে রহিমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে উঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের সহবাসের ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে নি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহিমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে-পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহিমা বলে,

—কী কমু? মাইয়াডা যানি কেমুন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে উঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেবেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়ে সারা সকাল কোরান শরিফ পাঠ করে। আজ নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীরকণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমারে বে-ইজ্জত করছ। খালি তা না, তুমি তাঁনারে নারাজ করছ। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার উপর তাঁনার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে,—আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়া বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিত। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

—হুনছ নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ করে সে বলে,

—দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছ তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এই কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

—তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার ঘরে। কখন তার ওজু ভেঙে গিয়েছিল খেয়াল করে নি। মাজার ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এল তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে আওয়াজ থেমে গেল। বড় বিস্মিত হল সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করল মাজার ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে। আবার বাইরে গেল, আবার এল ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হল যে, ওজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে ওজু বানিয়ে এল। এবার যখন সে মাজার ঘরে এল তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু-বিসর্জন করল মজিদ।

গল্পটা মিথ্যে। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায় নি সে মাজারপাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছু খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

—তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহিমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয় নি। দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। ওঘরে মজিদ হুঁকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। রহিমা ওজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন হুঁকায় টান মারে, আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহিমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে-পা টেপে রহিমা, ঘুণধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুঁকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে-থেকে কাচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে-ঝঙ্কার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। একসময়ে রহিমা আস্তে উঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভাব নামে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে উঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীরে-ধীরে মজিদ ওঠে। ওঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে—এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে-পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে-পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নি, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে উঠে তাকায় মজিদের পানে, প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারি যে, গলা ছেড়ে চিৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

—তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজেই ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয়, ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহিমা পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছিল, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদাতা'লার ন্যায়বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুচ্ছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহিমা! নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে উঠে বসেছিল, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে উঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাঁড়াল, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্তদৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকাল। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখল। তাতে হাত বুলাল না। বুলোবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেল না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চলল বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝল কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিল, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিল জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষে নি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসল জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল, এখন সে সমস্ত শক্তিসংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করল।

পেছনে-পেছনে রহিমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এও বুঝল না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক

ব্যাপারির মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহিমার পানে তাকাল, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,

—হে আমার মুখে থুতু দিল।

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল রহিমা,

—কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহিমার চিৎকার শুনল কি শুনল না, কিন্তু ওধারে তাকাল না, কোনো কথাও বলল না। আরো কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নেই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নেই। তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখল না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরো কঠিনতর করে তুলল। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে। ভেবেছিল, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকল মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। এবারেও সে অসতর্ক হল না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপিলণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়াদরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে এমনি সময়ে বুক-ফাটা কণ্ঠে মজিদ হো হো করে উঠল। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতায় সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দু-ফাঁক করে দিল। সভয়ে চমকে উঠে জমিলা তাকাল স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণ্যমান তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠল। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা

পচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেল। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা–নামা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মজিদও ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়াল। জমিলা দেখল পথ বন্ধ। যে–ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে–ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এইটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া–দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এই সময় সে বলে,

—দেখ, আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূত–প্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন–পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশেমানির ভাব জাগল না? কেনই–বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধল। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

—তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোড়া হইলে সে–ফোড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এইসব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ–বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে–মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বলল,

—ঝাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া–দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেল।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহিমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুটকণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—হে কই?

—মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ–বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব হে–জিন।

—ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

—কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুতু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের। দম খিঁচে ক্রোধ সংবরণ করে সে আবার বললে,

—তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহিমা ঘরে চলে গেল। গিয়ে ঘুমাল কি জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইল। যে-কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে—এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুলল। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নাই। থেকে-থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরো দূরে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে-থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু-বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নেই।

আরো সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে-থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে, এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে-সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে-অপেক্ষা যুগযুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে-বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে উঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে-অন্ধকারে তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়তো-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নাই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি-অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে তার মনে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন, কারণ ভ্রূর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘন কালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ উঠে

আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নোতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল-ফালাখ। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে-অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদসঙ্কেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎবেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে !

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহিমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। সে কোনো উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

—বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে !

রহিমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সেদিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে—যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিল।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমাট বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা হয়তো আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়ত, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হত। বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে-লুফে খেত খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে—তা দিনরাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শীষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহিমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। একসময়ে রহিমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

—কী হইল তোমার? দেখ না-শিলাবৃষ্টি পড়ছে!

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহিমা কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহিমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে-মাঠে কচি নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে-রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

—কী হইল তোমার বিবি?

রহিমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

—ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটা ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখল, লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমনকি তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে-ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহিমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না। শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

—না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহিমা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্প্রমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণযন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারো মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে—সব তো গেল! এইবার নিজেই-বা খামু কী, পোলাপানদেরই-বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

—নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো।

এরপর আর কারো মুখে কথা যোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।